জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন ২০২১

রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের রচনায় ইতিহাসবোধ ও সমাজমনস্কতা

সাজিয়া আফরিন*

Abstract

Rokeya Sakhawat Hossain (1880-1932) was an extraordinary leading figure in the history of Bengal who is considered as the pioneer of women's emancipation from the age old traditional thoughts and social bonds. She was far more advanced in her progressive thoughts than the contemporaries of her society. In this research paper, there is an attempt to show Rokeya's consciousness of the history of human society and civilization. She learned from history that the degrading condition of women is not divine, rather it is forced upon them by the rulers which is ultimately a product of class division. The paper also shows that Rokeya as a social reformer was conscious of the economic and political conditions of her time, which reflect her democratic, nationalist, non-communal and liberal approach which are very important for the advancement of a modern state.

ভূমিকা

ব্যক্তির আত্মসচেতন সত্তা গড়ে উঠে তার নিজস্ব সত্তা ও সামাজিক সত্তার সম্পর্ক পরম্পরার জটিল বিন্যাসে। ব্যক্তিসত্তার মাঝে ক্রিয়াশীল থাকে তার সহজাত বৃত্তি-প্রবৃত্তির প্রাধান্য আবার সামাজিক সত্তা হিসেবে ব্যক্তি জানতে চেষ্টা করে সে যে সমাজে অবস্থান করে তার গতি-প্রকৃতি ও সঙ্গতি-অসঙ্গতিকে। বিরাজমান পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তা একদিকে যেমন সচেতন হয়ে উঠে তার সমাজের সঙ্গতি ও অসঙ্গতি প্রসঙ্গে, অন্যদিকে ব্যক্তি নির্মাণ করতে চায় সেই নতুন ভাবমানস যা দূর করতে পারে সকল অসঙ্গতি। এই নতুন পথ নির্মাণ প্রক্রিয়া অগ্রসর হয় পুরাতন ও নতুনত্বের দ্বান্দ্বিকতায়। নিজ নিজ শ্রেণির ভাবাদর্শের প্রভাবে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা গড়ে উঠলেও পুরাতন ও নতুনত্বের দ্বান্দ্বিকতায় অগ্রসরমান থেকে ব্যক্তি যখন তার বর্তমান সমাজ ও সময়কে অতিক্রম করতে পারে তখনই ব্যক্তিসত্তা হয়ে উঠে কালাতিক্রমী ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন এমনই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যাঁর আবির্ভাব নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দক্ষিণ এশিয়ার নারী জাগরণের ইতিহাসে রোকেয়া এমন একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব যাঁর চিন্তার ঐশ্বর্য আজও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের পথ ধরে যে রেনেসাঁ এসেছিল তা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির জাতীয় প্রেরণা বিকাশকে আন্দোলিত করলেও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থানটি ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। অচল অনড় মুসলমান সমাজের ভিত্তিমূলে প্রবলভাবে ধাক্কা দিয়ে নারীদের অবমুক্তি ও জাগরণের ক্ষেত্রে রোকেয়ার যে আত্মত্যাগ ও অবদান তা এদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। যে প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রোকেয়ার অভ্যুদয়, ঐতিহাসিক বিবেচনায় শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নারীমুক্তি, সমানাধিকার এবং প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার প্রবক্তা হিসেবে তাঁকে বিশ্বের অনন্য মনীষার স্বীকৃতি দিতে হয়। সমাজের সবচেয়ে অবদমিত অবস্থানে থেকে রোকেয়া জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যে

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন তা বিস্ময়কর। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন বলতে বিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট শাখায় ডিগ্রি লাভ বা চিন্তাভাবনা করাকে বোঝায় না। বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা বা চিন্তা-ভাবনা করলেই একজন মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হয়ে ওঠে না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি মূলত একটি দার্শনিক চেতনাগত অবস্থান। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যুক্তিবোধ ও বিচারক্ষমতা যা দিয়ে তিনি বিষয়কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করেন। সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান, লোকাচার সম্পর্কিত তত্ত্ব ও মতবাদ কোনো কিছুই তিনি শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় হিসেবে গ্রহণ করেন না, বরং যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাইকৃত নির্যাসটুকুই কেবলমাত্র তার কাছে গ্রহণযোগ্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির ধারকেরা অবস্থিত বাস্তবতার আলোকেই জাগতিক সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করেন এবং সেগুলো মানুষের দ্বারাই মানুষের প্রয়োজনে বা স্বার্থে সৃষ্ট হয়েছে বলে মনে করেন। তাই সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবারে যেসব প্রথা-প্রতিষ্ঠান, বিধি-বিধান, রীতি-নীতি ও সংস্কার রয়েছে সেগুলোর কোনোকিছুই তাদের কাছে চরম ও পরম নয়। বরং তারা মনে করেন মানুষের প্রয়োজনে এগুলোকে পরিবর্তন বা বর্জন করা যাবে। অর্থাৎ ইহজাগতিক সমস্যার সমাধান ইহজাগতিকভাবেই মানুষের প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জন করা সম্ভব। তাই বিজ্ঞানচেতনা সম্পন্ন মানুষ কোনো বিষয়কে কার্যকারণ সম্পর্কের আলোকে ব্যাখা বিশ্লেষণ করেন এবং মূলগত উৎস উদঘাটনের মাধ্যমে সম্যকভাবে বিষয়কে বোঝার দিকে আগ্রহী মনোভাব পোষণ করেন। এর জন্য কোনো অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত প্রচেষ্টা তার কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। রোকেয়ার ইতিহাস চেতনা কতটা প্রখর ও বিজ্ঞানসম্মত ছিল তা মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর চিন্তা এবং সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। পত্রপত্রিকা কিংবা পাঠ্যপুস্তকগুলোতে রোকেয়া সম্পর্কে যা লেখা হয় তাতে তাঁর সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না বা অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। তাই রোকেয়াকে জানতে হলে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে কিভাবে তাঁর মধ্যে আধুনিক চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটল, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারাগুলোর সাথে তিনি কতটা পরিচিত ছিলেন এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি প্রকৃতপক্ষে কেমন ছিল। আলোচ্য প্রবন্ধটি রোকেয়ার সমাজ বিশ্লেষণকে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর ইতিহাস ভাবনাকে তুলে ধরার একটি সংক্ষিপ্ত প্রয়াস।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রোকেয়ার মানসজগৎ কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রীক ভাবালুতাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। সমস্যার গভীরে কার্যকারণগত উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে তাঁর চিন্তা আত্মকেন্দ্রিকতার সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর পরিসরকে গ্রহণ করেছিল। সমাজের অসঙ্গতিকে বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে রোকেয়ার বিভিন্ন বক্তব্য তাঁর ইতিহাস সচেতন- সত্তাকে প্রকাশ করে। রোকেয়ার সুচিন্তিত বক্তব্যসমূহকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর চিন্তার এই মৌলিকত্ব তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দিষ্ট।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

রোকেয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা পর্যবেক্ষণ করে এ কথা বলা যায়, নারী অধিকারের প্রশ্নে তাঁর বক্তব্য নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু রোকেয়ার ইতিহাস সচেতনতা অর্থাৎ মানবসভ্যতা বিকাশের ধারাবাহিকতায় দাস ব্যবস্থা ও পুরুষতান্ত্রিকতার আবির্ভাব, সম্পত্তিকে বণ্টনের প্রশ্নে শাসক-শোষিতের বৈষম্যমূলক সম্পর্ক, নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ, জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রভৃতি সম্পর্কে রোকেয়ার যে মূল্যবান বক্তব্য

রয়েছে, সে সম্পর্কে তেমন গবেষণা পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ সময়ের বিবেচনায় এসকল বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ নতুন ও বৈপ্লবিক। তাই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে রোকেয়া সম্পর্কে নতুন তথ্য সংযোজিত হবে এবং সাধারণ পাঠক ও আগ্রহী গবেষকবৃন্দ উপকৃত হবেন আশা করা যায়।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধটি মূলত একটি মূল্যায়নধর্মী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণী পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটির মৌলিক উৎস (Primary Source) হিসেবে গণ্য করা হয়েছে রোকেয়ার বিভিন্ন প্রবন্ধ ও সাহিত্যকর্ম। এছাড়াও রোকেয়া সম্পর্কে অন্যান্য গবেষকদের গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকেও সহায়তা নেওয়া হয়েছে যা এই প্রবন্ধের গৌণ উৎস (Secondary Source) হিসেবে বিবেচিত হবে। ঐতিহাসিক পদ্ধতির মাধ্যমে মৌলিক ও গৌণ উৎস থেকে তথ্যাদি (Data) সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণী পদ্ধতিতে (Analytic Method) তা যাচাই-বাছাইপূর্বক উপস্থাপন করা হয়েছে।

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ

সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি সুনির্দিষ্ট স্তরে যখন স্থায়ী সম্পত্তির আবির্ভাব ঘটলো তারপর থেকে মানুষ শাসক ও শোষিত এ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শাসক শোষিতের বিভক্তির প্রথম নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় সমাজ সভ্যতায় নারী-পুরুষের বিভক্তির ইতিহাসে। সমাজ বিভক্তির সাথে নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং বিভক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে আজকের যুগের মতো নারী পুরুষের বৈষম্যের কোনো স্মৃতি-চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা যায়, উৎপাদিকা শক্তি অর্থাৎ হাল- হাতিয়ার, উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ সম্মিলিত নারী-পুরুষ এবং উৎপাদনের ক্ষেত্র অর্থাৎ গোটা প্রকৃতি যেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা যায়। এ সমাজে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, হাল হাতিয়ার ছিল অনুন্নত, ভঙ্গুর এবং অপর্যাপ্ত। কিন্তু হাল হাতিয়ার ব্যবহারে নারী-পুরুষের ছিল সমান অধিকার এবং সমান ব্যবহার। সভ্যতার বিশেষ স্তরে এসে মানুষ যখন প্রকৃতির সাথে লড়াই করা শিখল, তখন পাশাপাশি মানুষ উৎপাদনের হালহাতিয়ারও উন্নয়ন করেছে। তখনও সভ্যতার ভিতরে নারী পুরুষের মধ্যে কোনোরূপ বিভেদ তৈরি হয়নি। একদিকে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি ও উৎপাদনের ক্ষেত্র সংকোচন, আবার অন্যদিকে উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়নের একটা পর্যায়ে যখন স্থায়ী সম্পত্তির আবির্ভাব ঘটল তখন ভোগ্যবস্তু সম্ভার দেখা দিল। পণ্য ভোগ এবং দখলকে কেন্দ্র করে মানবগোষ্ঠীর কিছু অংশ দখল-দারিত্বের মনোবৃত্তিতে প্রবেশ করলো। কারণ তাদের প্রত্যহ খাদ্য সংকটকে কেন্দ্র করেই তারা আধিপত্যবাদী হয়ে উঠে। শুধু অবদমিত দুর্বল পুরুষ জাতিকেই নয়, নারী জাতিকেও তারা করেছে শারীরিক এবং মানসিকভাবে বন্দী। সমাজের এই স্তরে নারীরা কৃষিকাজে যথেষ্ট ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও, নারীর উৎপাদন পদ্ধতির সকল ফসল এবং উৎপাদিকা শক্তি কুক্ষিগত করে তারা। এই শক্তিশালী গোষ্ঠী কেবল জবরদস্তির মাধ্যমে পরাজিত গোষ্ঠীকে অধীনস্থ করেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে দেখা যায়, নারীরা আদিকালে শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতায় পুরুষের পিছনে ছিল না। নারীরা কেবল ভোগের বস্তু, পুরুষের তুলনায় হীন, দেহ-মন, চিন্তন, দক্ষতা, যোগ্যতায় পুরুষদের তুলনায় পিছিয়ে, প্রাকৃতিকভাবে অযোগ্য-এসব অনৈতিহাসিক সিদ্ধান্ত এবং অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অসারতা তুলে ধরে এঙ্গেলস বলেছিলেন, যতদিন সমাজে বিভক্ত শ্রেণি তৈরি হয়নি, নারী-পুরুষের সম্মিলিত সামাজিক সম্পত্তির উপর ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ততদিন

পর্যন্ত নারীরা পুরুষের অধীনস্থ হয়নি। বরং প্রথা, প্রতিষ্ঠান, আইন, কানুন, রাষ্ট্র ও পরিবার উৎপত্তির আগে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে নারীরাই সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল। কারণ একদিকে মানুষের বংশ পরম্পরা সৃষ্টি, আরেকদিকে সামাজিক উৎপাদন- এই দুটি সমান তালে চলতে গিয়ে নারীরাই সমাজের প্রধান পরিচালনা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এঙ্গেলসের ভাষায়,

> "মাতৃ-অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালীর কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হলো পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তানসৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।"[১]

সভ্যতার ক্রমবিকাশের একটা পর্যায়ে নারীজাতির অধঃপতন এবং অধীনতার এই ইতিহাস সম্পর্কে রোকেয়া সচেতন ছিলেন। প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মৌলবাদী ধ্যানধারণা ও শিক্ষাব্যবস্থাকে রোকেয়া কতটা প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন তা আমরা দেখতে পাই তাঁর 'আমাদের অবনতি' এবং 'সুলতানার স্বপ্ন' রচনা দুটিতে। ইতিহাস সচেতন ছিলেন বলেই এঙ্গেলসের মত রোকেয়া দেখিয়েছেন নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চবর্ণ- নিম্নবর্ণের মানুষের মাঝে যে বিভেদ বিরাজমান, তা প্রাকৃতিক নয় বরং মানবসৃষ্ট। নারী-পুরুষের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে পুরুষতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তর তৈরিতে ধর্মীয় কুসংস্কার, শাস্ত্রীয় মতবাদ এবং লোকাচারগুলো কিভাবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অমূলক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেছে রোকেয়া যে অসীম সাহসের সাথে সেগুলো উপস্থাপন করেছেন তা বিস্ময়কর। রোকেয়া লিখেছেন,

> আমাদের যথাসম্ভব অধঃপতন হওয়ার পর দাসত্বের বিরুদ্ধে কখনও মাথা তুলিতে পারি নাই; তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় যে, যখনই কোন ভগ্নী মাথা উত্তোলনের চেষ্টা করিয়াছেন অমনই ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন-রূপ অস্ত্রাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। [...] আমরা যখনই উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি তখনই সমাজ বলে: "ঘুমাও ঘুমাও, ঐ দেখ নরক' মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্ততঃ আমরা মুখে কিছু বলি না নীরব থাকি।"[২]

বিশেষ কোনো শ্রেণি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় বা ব্যক্তিকে মুক্ত হওয়ার কথা রোকেয়া বলেননি। তিনি বলেছেন গোটা মানবজাতির মুক্তির কথা। কারণ নারীর অধঃপতিত অবস্থানের জন্য পুরুষতান্ত্রিক অভিজাততন্ত্র যেমন দায়ী, ঠিক তেমনি শাসক-শোষিতের, মালিক-মজুরের শোষণ নিপীড়নের যে শাসন ব্যবস্থা সেটাও দায়ী। তিনি নারী মুক্তির কথা বলে বরং সেই দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত দিয়েছেন। হাজার বছরের দাসত্বের নাগপাশ ছিন্ন করে গোটা মানব জাতির মুক্তির মধ্যেই তিনি নারী মুক্তির যৌক্তিকতা এবং কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বুঝেছিলেন সভ্যতা, রাষ্ট্র, সমাজের বিধিব্যবস্থা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে, ধনী গরীবের বৈষম্যকে জিইয়ে রেখে নারী মুক্তি অর্জন কখনও সম্ভব নয়। রোকেয়া ছিলেন সকল পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে নতুন মানুষ, নতুন সমাজ নির্মাণের পথপদর্শক। ইতিহাসের পাতায় একদল শাসকগোষ্ঠী কীভাবে বারংবার নারীকে পরাধীনতার শিকল পরিয়ে গোটা মানবজাতিকেই পরাজিত করেছে তা-ই বারবার তিনি উচ্চারণ করেছেন। রোকেয়া ইতিহাস থেকে যথাযথ শিক্ষা নিয়েছেন যে, নারী-পুরুষের বিভেদহীন একটা সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণ ব্যতীত সমাজ-সভ্যতার কোনো অন্যায় বিভক্তি, অপমান, শাসন, শোষণ, নিপীড়ন বন্ধ করা যাবে না। ইতিহাসের অনৈতিক গতিধারা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। তাঁর নিজস্ব শ্রেণিচেতনা দিয়ে সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন,

> আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজবন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোন অজ্ঞান কারণবশতঃ

> মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানাবিষয়ে উন্নতি করিতে লাগিল, অপর অংশ (নারী) তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেইরূপ উন্নতি করিতে পারিল না বলিয়া পুরুষের সহচরী বা সহধর্ম্মিনী না হইয়া দাসী হইয়া পড়িল।...যে সমাজ রাজা ও প্রজা সৃষ্টি করিয়াছে, পুলিশ প্রভু ও বড়লাট প্রভুর মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই সমাজ নারীকে নরের অধীন করিয়াছে।[৩]

নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠার ইতিহাস রোকেয়া তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তি বোধসম্পন্ন মনন কাঠামো দিয়ে সহজেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সমাজ যখন ভূমিদাস এবং দাস মালিক এই দুই শ্রেণীতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, তখন সকল উৎপাদিকা শক্তি কুক্ষিগত করে মালিকগোষ্ঠী নারীকে করে রাখে গৃহবন্দী। ভোগের বস্তু হিসেবে নারীকে দাসীবৃত্তিতে বাধ্য করে। উৎপাদনের সকল শাখা প্রশাখায় নারীর অংশগ্রহণ অনিশ্চিত করে দেয়। রোকেয়া নারী জাতির অবনতির কারণ হিসেবে সুযোগের অভাব এবং সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণের পথে বাধা প্রদানকে দায়ী করেন। তিনি উল্লেখ করেন,

> স্ত্রীজাতি সুবিধা না পাইয়া সংসারের সকল প্রকার কার্য্য হইতে অবসর লইয়াছে। এবং ইহাদিগকে অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য দেখিয়া পুরুষজাতি ইহাদের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল! ক্রমে পুরুষ পক্ষ হইতে যতই বেশী সাহায্য পাওয়া যাইতে লাগিল, স্ত্রী-পক্ষ ততই অধিকতর অকর্ম্মণ্য হইতে লাগিল। এদেশের ভিক্ষুদের সহিত আমাদের বেশ তুলনা হইতে পারে। একদিকে ধনাঢ্য দানবীরগণ ধর্ম্মোদেশ্যে যতই দান করিতেছেন, অন্যদিকে ততই অধম ভিক্ষুসংখ্যা বাড়িতেছে! ক্রমে ভিক্ষাবৃত্তি অলসদের একটা উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন আর তাহারা ভিক্ষা গ্রহণ করাটা লজ্জাজনক বোধ করে না। ঐরূপ আমাদের আত্মাদর লোপ পাওয়ায় আমরাও অনুগ্রহ গ্রহণে আর সঙ্কোচ বোধ করি না। সুতরাং আমরা আলস্যের, -প্রকারান্তরে পুরুষের-দাসী হইয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হইয়া গিয়াছে এবং আমরা বহু কাল হইতে দাসীপনা করিতে করিতে দাসত্বে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপ আমাদের স্বাবলম্বন, সাহস প্রভৃতি মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলি অনুশীলন অভাবে বারবার অঙ্কুরে বিনাশ হওয়ায় এখন আর বোধ হয় অঙ্কুরিতও হয় না।[৪]

রোকেয়ার সংগ্রাম মূলত সমাজ সভ্যতার বিভক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একজন আপসহীন ধারার লড়াকু শক্তি হিসেবে তিনি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। তিনি লড়ে গেছেন অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে, যার ভিতরে লুকিয়ে আছে পুরুষতন্ত্র। একদল আধিপত্যবাদী সাঁড়াশি বাহিনীর আবির্ভাব ঘটার পর মানুষ হয়ে পড়ে মানুষের শেকলে বন্দী। অবনত জাতিকে শোষণ এবং এর স্থায়িত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তৈরি হয় শোষক শ্রেণির পরিপূরক রক্ষীবাহিনী এবং ধর্মব্যবসায়ী, যারা শোষিতের সংঘটিত প্রতিরোধগুলোকে দমিয়ে রাখে। প্রতিবাদের সকল দরজা বন্ধ করে দেয় সমাজের সকল স্তরে। এই সাঁড়াশি বাহিনীর আক্রমণ থেকে নিষ্পেষিত নারী-পুরুষ কেউই রেহাই পায় না। নারীর প্রতি অপমান, অপদস্ততা, শোষণ, মর্যাদাহানি, অবদমন চলে অধিষ্ঠিত পুরুষতান্ত্রিক অভিজাততন্ত্রের নানান রকম আইনি শৃঙ্খলে। একদল শোষকের দীর্ঘদিনের জয়যাত্রা পৃথিবীর দেশে দেশে নারীকে করেছে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী। মানুষের পৃথিবীকে পাশে ঠেলে করেছে শাসকের পৃথিবী। পৃথিবীর দেশে দেশে শোষণকে টিকিয়ে রাখার জন্য তৈরি হয়েছে রাজার আইন, শাসকের আইন, প্রথা, প্রতিষ্ঠানের আইন। রোকেয়া এই ঐতিহাসিক পটভূমি জেনেছেন তাঁর সম্প্রসারিত জ্ঞান দিয়ে। দেশ বিদেশের বই, জার্নাল, পত্রপত্রিকা পড়ে এবং ইতিহাসের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তিনি 'আমাদের অবনতি' শীর্ষক প্রবন্ধটির শিরোনাম প্রথমে লিখেছিলেন- 'অলঙ্কার না Badge of Slavery?'। সমাজে দমন পীড়ন এবং নারী পুরুষের বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার নিমিত্তে ধর্মের নামে কঠোর বিধিনিষেধ, অনুশাসন ও গোঁড়ামির ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে রোকেয়া বলেন,

> আমাদিগকে প্রতারণা করিবার নিমিত্ত পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে 'ঈশ্বরের আদেশপত্র' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ...এই ধর্মশাস্ত্রগুলি পুরুষ রচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে! মুনিদের বিধানে যে-কথা শুনিতে পাও, কোন স্ত্রী মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতে। ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ ঈশ্বরপ্রেরিত বা ঈশ্বরাদিষ্ট নহে।

রোকেয়া প্রশ্ন তুলেছিলেন,

> যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী-শাসনের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধহয় কেবল এশিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া 'রমণী জাতিকে নরের অধীন থাকিতে হইবে' ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ঈশ্বর কি কেবল এশিয়ারই ঈশ্বর?[৫]

সমাজ অভ্যন্তরে অসংখ্য অসঙ্গতির খাদ কোথায় লুকিয়ে আছে তার ব্যাপারে রোকেয়া ছিলেন চিন্তাশীল। সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে তিনি অবলোকন করেন যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে। শুধু তাঁর সময়ের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, বরং বর্তমান সমসাময়িক যুগেও রোকেয়ার পর্যবেক্ষণ সমাজে প্রযোজ্য। যার অর্থবিত্ত আছে তার হাতেই রয়েছে আইন কানুন, সমাজ পরিচালনার হাতিয়ার। নারী দাসীরূপে সেবাদান করে যাচ্ছে যুগের পর যুগ। নারীদের এই অধঃপতনের কারণ নারীর জন্মগত নয়। তিনি যথাযথ চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন "সম্ভবতঃ সুযোগের অভাব ইহার প্রধান কারণ।"[৬]

রোকেয়ার একশ বছরেরও বেশি আগে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহিয়সী নারী মেরী ওলস্টোনক্রাফ্‌ট। ইউরোপের বদ্ধমূল চিন্তা পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতামত রেখেছিলেন। মেরি মনে করেন, পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক পরিবেশে নারীরা এমনভাবে বেড়ে ওঠে যে, সমাজের প্রয়োজনে বা মহৎ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার চেয়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যের দ্বারা পুরুষকে আকৃষ্ট করতেই তারা বেশি নিবেদিত। *Vindication* এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "[....] কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সভ্য সমাজের নারীরা উৎকণ্ঠিত থাকে কেবল, প্রেম ভালোবাসাকে উৎসাহিত করতে, তারা বাধ্য হয় অন্যান্য মহৎ উচ্চাকাঙ্খা, যোগ্যতা ও নৈতিক সদগুণ দ্বারা অর্জিত সম্মানকে বিসর্জন দিতে।"[৭] রোকেয়া একই আঙ্গিকে না গিয়ে বরং ভিতরের নিয়ামক তথা সমাজ এবং সভ্যতার বিভক্ত ইতিহাসের দিকে নজর দিয়েছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি যে, মহৎ বৃত্তি প্রবৃত্তির চেয়ে অলঙ্কারের প্রতি নিবেদিত হওয়া নারীর আত্মমর্যাদার হীন অবস্থার নির্দেশক। নারীর সাজসজ্জার উপকরণ অলঙ্কারগুলোকে তিনি বর্ণনা করেছেন, "দাসত্বের চিহ্ন" বলে। দ্বিখণ্ডিত শ্রেণিসমাজ আবির্ভাবের পরে পরাস্ত নারী পুরুষদের দাস হিসেবে কেনাবেচা করার জন্য গলা, হাত, পা, কোমরে শৃঙ্খল শিকল পরিয়ে রাখা হত যা বশ্যতাকে তুলে ধরে। শোষণ নিপীড়নের এই বস্তুগুলো পরবর্তী সময়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির আদরের বস্তুতে পরিণত হয়, এই ইতিহাস রোকেয়া জানতেন। তাই অতি শ্লেষাত্মক কটাক্ষের সাথে তিনি বলেছেন,

> আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি-এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ! এখন ইহা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তির মতে অলঙ্কার দাসত্বের নিদর্শন (originally badges of slavery) ছিল। তাই দেখা যায় কারাগারে বন্দীগণ পায় লৌহনির্ম্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিষ বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ "মল" পরি। উহাদের হাতকড়ী লৌহ-নির্ম্মিত, আমাদের হাতকড়ী স্বর্ণ বা রৌপ্য- নির্ম্মিত চুড়ি! বলা বাহুল্য, লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dogcollar) দেখি, উহারই অনুকরণে

> বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্ম্মিত হইয়াছে! অশ্ব হস্তী প্রভৃতি পশু লৌহ- শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সেইরূপ আমরা স্বর্ণ -শৃঙ্খলে কণ্ঠ শোভিত করিয়া মনে করি "হার পরিয়াছি"। গো-স্বামী বলদের নাসিকা বিদ্ধ করিয়া "নাকাদড়ী" পরায়। এদেশে আমাদের স্বামী আমাদের নাকে "নোলক" পরাইয়াছেন!!... যাঁহার শরীরে দাসত্বের নিদর্শন যত অধিক, তিনি সমাজে ততোধিক মান্যাগণ্যা! এই অলঙ্কারের জন্য ললনাকূলের কত আগ্রহ! যেন জীবনের সুখ সমৃদ্ধি উহারই উপর নির্ভর করে। তাই দরিদ্র কামিনীগণ স্বর্ণরৌপ্যের হাতকড়ী না পাইয়া কাচের চুড়ি পরিয়া দাসী-জীবন স্বার্থক করে।...যদি অলঙ্কারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কি কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে? পুরুষেরা ইহা পরাজয়ের নিদর্শন ভাবেন। তাঁহারা কোন বিষয় তর্ক করিতে গেলে বলেন, "আমার কথা প্রমাণিত করিতে না পারিলে আমি চুড়ি পরিব।"[৮]

ওলস্টোনক্রাফটের মতো রোকেয়াও গোটা ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন। ঔপনিবেশিক শাসকের শোষণ নিপীড়নের ক্ষেত্রবিশেষ হিসেবে ভারতবর্ষ চিরকাল বিদেশি বিভাষি বিজাতি দ্বারা শোষিত। শোষণ নিপীড়নের সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার নারী জাতি। ভারতবর্ষের সকল ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ছিল পুরুষ। আবার দেশীয় অধিপতিরাও ছিল পুরুষ- হিন্দু রাজা, হিন্দু অধিপতি, মুসলিম রাজা, মুসলিম অধিপতি, খ্রিষ্টান শাসক, খ্রিষ্টান অধিপতি। অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশে সকল কর্তৃত্ববাদ এসেছে পুরুষের হাত ধরে। ধর্মে ধর্মে বিভক্তি থাকলেও শাসন শোষণে ছিল পুরুষতান্ত্রিক অভিজাততন্ত্র। রোকেয়া সমাজ সভ্যতা প্রগতির পথে প্রথম বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নারী পুরুষের বৈষম্য। শ্রেণি-আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, সম্পদ ভোগ দখল, সম্পত্তির উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে নরনারীর মধ্যে কৃত্রিম বৈষম্য কিভাবে কাজ করে রোকেয়া তা উপলব্ধি করেছেন। নারীরা সর্বত্রই নিপীড়নের শিকার দেখে তিনি বলে ওঠেন,

> আমাদের যখন স্বাধীনতা ও অধীনতাজ্ঞান বা উন্নতি ও অবনতির যে প্রভেদ তাহা বুঝিবার সামর্থ্যটুকুও থাকিলনা, তখন কাজেই তাঁহারা ভূস্বামী, গৃহস্বামী, প্রভৃতি হইতে ক্রমে আমাদের "স্বামী" হইয়া উঠিলেন। আর আমরা ক্রমশঃ তাঁহাদের গৃহপালিত পশু পক্ষীর অন্তর্গত অথবা মূল্যবান্ সম্পত্তি বিশেষ হইয়া পড়িয়াছি।... কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, "স্বামী" শব্দের অর্থ কি? দানকর্ত্তাকে "দাতা" বলিলে যেমন গ্রহণ কর্ত্তাকে "গ্রহীতা" বলিতেই হয়, সেইরূপ একজনকে "স্বামী, প্রভু, ঈশ্বর" বলিলে অপরকে "দাসী" না বলিয়া আর কি বলিতে পারেন?"[৯]

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজদেহ পচনের পথ্য আবিষ্কারে রোকেয়া সচেষ্ট ছিলেন। দেহের যেমন অসংখ্য নার্ভ সিস্টেম রয়েছে, কিন্তু রক্ত শুকিয়ে গেলে প্রতিটি নার্ভ সিস্টেম চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পুরুষকে যদি দেহের নার্ভের মত দেখা হয় তাহলে নারী সমাজ দেহের রক্ত। রক্ত প্রবাহের মতো মেটাবলিক ফাংশনটাই বন্ধ হয়ে যাবে যে কোনো একটাকে বাদ দিয়ে দিলে। রোকেয়া দেখেছেন পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে নারীকে অবদমিত করে রাখা হয়নি। সমাজদেহকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি নারীর পিছিয়ে পড়ার ঐতিহাসিক কারণ উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রোকেয়া দেখেছেন নারী জাতি পৃথিবীর সর্বত্রই নিষ্পেষিত নিপীড়িত। মেরি করেলি রচিত *Murder of Delicia* উপন্যাসের অংশবিশেষ অনুবাদ করে রোকেয়া ডেলিশিয়ার মতো ভারতবর্ষে অবদমিত, নিষ্পেষিত, নির্যাতিত নারী চরিত্র হিসেবে একজন 'মজলুমা'র কথা উল্লেখ করেছেন,

> ইংরেজ রমণীর জীবন কিরূপ? আমরা মনে করি, তাঁহারা স্বাধীন, বিদূষী, পুরুষের সমকক্ষা, সমাজে আদৃতা,- তাঁহাদের গৃহাভ্যন্তরে উঁকি মারিয়া দেখিতে পাইলে বুঝি সব ফাঁকা! দূরের

> ঢোল শুনিতে শ্রুতিমধুর! সভ্যতা ও স্বাধীনতার লীলাভূমি লন্ডন নগরীতে শত শত "ডেলিশিয়া বধকাব্য" নিত্য অভিনীত হয়! হায়! রমণী পৃথিবীর সর্বত্রই অবলা!![১০]

অধঃস্তন দশার চিত্র এক হলেও ইংল্যান্ডের ডেলিশিয়া আর পরাধীন ভারতবর্ষের মজলুমার মধ্যে যে পার্থক্যটুকু রয়েছে তা দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন, "ডেলিশিয়া স্বাধীনা, রাজার জাতি এবং অন্তঃপুর বন্দিনী নহেন, কিন্তু উভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য কতটুকু? অধিক নয়,-উভয়ে অবলা! উভয়ই সমাজের অত্যাচারে মর্ম্মপীড়িতা! কিন্তু ডেলিশিয়া বিদুষী এবং মজলুমা নিরক্ষর -এই একটা ভারী পার্থক্য আছে।... ইহার কারণ এ দেশের স্ত্রীশিক্ষার অভাব। মজলুমা ভূমিষ্ঠা হইয়াই শুনিতে পায়, "তুই জন্মেছিস গোলাম; চিরকাল থাকবি গোলাম। সুতরাং তাহার আত্মা পর্য্যন্ত গোলাম হইয়া গিয়াছে। সে আর নিজের মূল্য জানে না- পুরুষ আত্মীয়দের কর্তৃক বারম্বার পদদলিত হইলেও সে তাহাদের পদ-লেহনে বিরত হয় না। স্বাধীনা ডেলিশিয়ায় ও পরাধীন মজলুমায় এই প্রভেদ।"[১১] এই উপন্যাসে রোকেয়ার তীক্ষ্ণ যুক্তিসিদ্ধ মনন এবং লড়াই সংগ্রামের তেজী মনোভাব ফুটে উঠেছে -"সমাজ সংস্কার করিতে হইলে কতিপয় মজলুমাকে ডেলিশিয়ার ন্যায় 'সমরশায়িনী' হইতে হইবে। তা সাধুদের আত্মোৎসর্গ বিনে এ জগতে কখন কোন্ ভাল কাজটি হইয়াছে!"[১২] রোকেয়া জানতেন যেকোনো মতাদর্শকে বিচার-বিবেচনা করতে হয় তার অবস্থিত বাস্তবতার আলোকে। স্থান, কাল নিরপেক্ষভাবে কোনো আদর্শ যেমন গড়ে উঠতে পারে না, তেমনি একটি উন্নত অবস্থার দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান। স্থান, কাল, পাত্র, সমাজ বাস্তবতার কার্যকারণ নিয়ে সচেতন রোকেয়া তাই বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি নামক অভিভাষণে বলেছেন,"স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য হইয়া পড়ে।"[১৩]

অর্থনৈতিক চিন্তা

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা উর্বর ভূমির এই ভারতবর্ষে ৯০ ভাগ মানুষ ছিল কৃষিনির্ভর। আধা সামন্তবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্বে ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকেরা। দেশের অভ্যন্তরে মোট জনগোষ্ঠীর সিংহভাগ ছিল ভূমিদাস কৃষক। সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ছিল শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। আসাম, উত্তর প্রদেশ, ত্রিপুরা, পূর্ব বাংলাসহ গোটা ভারতবর্ষের বেশীরভাগ অংশ ছিল কৃষকের চারণভূমি। তাই ভারতবর্ষের জনগণের খাদ্য সরবরাহের প্রধান উৎসও ছিল কৃষি। ভারতবর্ষের জীবনমান উন্নয়ন এবং শিল্পোন্নয়নেও রয়েছে কৃষির অভাবনীয় অবদান। মানুষের আর্থিক কাঠামো দাঁড়িয়ে ছিল কৃষিকাজ তথা কৃষি ফসল উৎপাদন পদ্ধতির উপর। সমাজের নিম্নবিত্তের মধ্যে কৃষক, ক্ষেতমজুরই ছিল ভারতবর্ষের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। কৃষকের উৎপাদিত ফসল বিদেশে রপ্তানি করে দেশ হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক ঋতুভিত্তিক ফসলের উৎপাদন ভারতের জনগণকে করেছিল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই রোকেয়ার দৃষ্টি ছিল কৃষক, ক্ষেতমজুর, দিনমজুরের দিকে। রাষ্ট্রের উৎপাদন এবং অর্থনীতির চালিকাশক্তিকে অবহেলায় রেখে রাষ্ট্র কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। রোকেয়া জানতেন কৃষি এবং কৃষকের উৎপাদিত ফসলের দাম এবং বণ্টন জাতীয় অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। কিন্তু অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, দুর্যোগ, প্লাবনে ফসল নষ্ট হলে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়, জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়, শিল্প কলকারখানায় কাঁচামালের অভাবে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, বৈদেশিক রপ্তানি আয় কমে যায়, ফলে গোটা দেশ পড়ে থাকে অচলায়তনে। দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি এবং মোট জাতীয় উৎপাদন (জি.এন.পি), বণ্টন, বৈদেশিক বাণিজ্য,

রাষ্ট্রীয় কোষাগার ইত্যাদি মূলত কৃষি ফসল এবং কৃষকের উৎপাদিত মোট পণ্যের উৎপাদন-বিতরণের উপর নির্ভর করে। এই অর্থনৈতিক মডেলটা রোকেয়া জানতেন। সেই সময় ভারতবর্ষের কৃষি এবং কৃষকের প্রতি মনোযোগের অভাবে খাদ্য উৎপাদনে স্বল্পতা তৈরি হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্যাভাব, অপুষ্টিতে ভোগা, ভিটামিন -এ এর অভাবজনিত রাতকানা রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি, হাম, গুটি বসন্ত, প্লেগ, মহামারি, বেশির ভাগ নারীর রক্তস্বল্পতা, ভিটামিন ও মিনারেলের অভাবে গলগণ্ডরোগ প্রভৃতি বৃদ্ধি পেয়েছিল। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনির, পর্যাপ্ত শাকসবজি গ্রহণ ব্যতীত সুস্থ জীবনযাপন করা সম্ভব নয়- রোকেয়া একথা বার বার তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সুস্থ জীবন প্রবাহ টিকিয়ে রাখার পেছনে কৃষকের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। তাই কৃষকের অর্থনৈতিক সমতা যদি নিশ্চিত না হয়, অর্থাৎ বৈষম্যমূলক সমাজে, কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, কারণ মুষ্টিমেয় ধনী সমগ্র ভারতবর্ষের অধিবাসী নয়। 'চাষার দুক্ষু' প্রবন্ধে রোকেয়া লিখেছেন, "কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে এবং মুষ্টিমেয়, সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে। অদ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়, চাষার দারিদ্র্য। চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড।"[১৪]

আবার "এণ্ডি শিল্প" প্রবন্ধেও তিনি কৃষিশিল্প সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। এই শিল্পের যথাযথ পরিচর্যার মাধ্যমে সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একটি নতুন দিক কিভাবে উন্মোচিত হতে পারে সে প্রসঙ্গে রোকেয়া তাঁর মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসকদের আমলে এই শিল্প কি করে আমাদের অবহেলায় বিনষ্ট হয়ে গেল এবং এর ফলশ্রুতিতে সমাজ কতটা ক্ষতির সম্মুখীন হল তার ব্যাখা তিনি দিয়েছেন, যা একদিকে তাঁর অর্থনৈতিক সচেতনতা এবং অন্যদিকে তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞানেরও পরিচয় দেয়। রোকেয়া পরিতাপ করে জানিয়েছিলেন সম্ভাবনাময় এই শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা, আসাম অঞ্চলে এই এণ্ডি বস্ত্র বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয় বলিয়া আমাদের গুরুর-দেড় শত বৎসরের গুরু ইউরোপীয়গণ ইহাকে "আসাম সিল্ক" বলিয়া অতি আদরের সহিত ইহা দ্বারা কোট, স্কার্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি, আমরাও হোয়াইট এ্যাওয়ে লেডলর দোকান হইতে "আসাম সিল্ক"- এর সুট ক্রয় করিয়া পরিধান করা ফ্যাশন মনে করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমরা এই মূল্যবান শিল্পের উন্নতির কোন চেষ্টা করিলাম না। ক্রমে রংপুরের চাষা ও আসামের বন্য পাহাড়ি স্ত্রীলোকেরা এন্ডি সুতা কাটা ভুলিয়া গেল। ফলে এখন আসাম হইতে গুটী বিদেশে রপ্তানী হয়, তথা হইতে কলে সুতা প্রস্তুত হইয়া পুনরায় আসামে আইসে। স্থানীয় তন্তুবায়গণ সেই সূত্রে বস্ত্র প্রস্তুত করে, পরে সেই "আসাম সিল্ক" কলিকাতার কোন কোন দোকানে বিক্রীত হয়।[১৫]

যেকোনো আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি নির্মাণ করতে হলে সামাজিক উৎপাদনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমপরিমাণ অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নারীকে সামাজিক কাজে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ক্রিয়া কর্মে, আইন প্রণয়নে, রাষ্ট্রীয় কাজে, জনহিতকর কাজে, সরাসরি নিযুক্ত করার মাধ্যমে রান্নাঘরের একঘেয়ে জীবন থেকে টেনে বের করতে না পারলে একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, গণতান্ত্রিক সমাজ, গণতান্ত্রিক পরিবার গঠন অসম্ভব। তাই রোকেয়ার দাবি, নারী-পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক সকল অঞ্চলে নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। অফিস আদালত, কোর্ট কাচারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কল কারখানা, রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর এবং কৃষি কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরিবারের অভ্যন্তরে কর্তৃত্ববাদী মানসিকতা ও বৈষম্য দূর করতে হলে নারীকে

অর্থনৈতিক মুক্তি সবার আগে দিতে হবে। অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সামাজিক উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। প্রখর যুক্তিবাদী রোকেয়া কেবল ভাববাদের উপর নির্ভর করে নারীমুক্তি কামনা করেননি। রোকেয়া তাঁর বাস্তব জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন স্বাধীনতার একটি অপরিহার্য শর্ত আর্থিক মুক্তি অর্থাৎ স্বচ্ছলতা। কারণ স্বাধীন জীবন যাপন, স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন আর্থিকভাবে সাবলম্বী হওয়া ব্যতীত দুরূহ ব্যাপার। নারীদের প্রতি তাই রোকেয়ার উদাত্ত আহ্বান:

> পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিলে স্বাধীনতা লাভ হয়, তবে তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীম্যাজিষ্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডী জজ- সবই হইব! পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী ঠরপবৎড়ু হইয়া এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব! উপার্জ্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কি নাই? যে পরিশ্রম আমরা "স্বামী"র গৃহকার্য্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না? আমরা যদি রাজকীয় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব।"[১৬]

আবার আর্থিক মুক্তির সাথে যদি দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মানসিক মুক্তি না ঘটে তাহলে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। বর্তমান সমাজেও আমরা দেখি নারীরা অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করলেও বহুলাংশেই মানসিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে নি। এর কারণ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিরাজমান থাকে মানসিক দাসত্ব যার খোঁজ রোকেয়া পেয়েছিলেন। তাই মানসিক দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন রোকেয়া বলে উঠেন, "বহুকাল হইতে নারীহৃদয়ের উচ্চবৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায় নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই "দাসী" হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর আমাদের হৃদয়ে স্বাধীনতা, ওজস্বিতা বলিয়া কোন বস্তু নাই -এবং তাহা লাভ করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত লক্ষিত হয় না! তাই বলিতে চাইঃ "অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি!"[১৭] এ জাগরণ হল চেতনার জাগরণ, হাজার হাজার বছর ধরে লালন করা দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভের ইচ্ছায় সচেতন জাগরণ।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা

প্রচণ্ড ক্ষয়িষ্ণু একটি আধা সামন্তবাদী সমাজ ও উঠতি পুঁজিবাদী আর্থসামাজিক ব্যবস্থা- এই দুইয়ের ক্রান্তিলগ্নে একটি রোগ দেখা দেয়, তা হল "সাম্প্রদায়িকতা"- যা সম্পর্কে রোকেয়ার অন্তর্দৃষ্টি ছিল গভীর। বিভেদমূলক সমাজে শক্তিশালী হয়ে উঠে সাম্প্রদায়িক উগ্র দ্বন্দ্ব, যা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং সম্মিলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রয়াসের বিরুদ্ধে। তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সমাজ কাঠামো ছিল হিন্দুধর্মের প্রভাবে আচ্ছন্ন, যা পরবর্তী সময়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অবিভক্ত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতীয় জনগণ সমাজের অভ্যন্তরে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চা করেছে ধর্মীয় বিশ্বাস, আবেগ, অনুভূতিকে ভিত্তি করে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার পরেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ হিন্দু ধর্মীয় প্রভাব থেকে বের হতে পারেনি। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিম্নবিত্ত কৃষকের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, যা পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। এ কারণে ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা এ দেশ থেকে বিতাড়িত হলে দেশের শাসন ভার চলে যাবে হিন্দু স্বৈরাচারী শাসকের হাতে। ফলে মুসলিম অধ্যুষিত জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অধিকারে

নিজস্ব কোনো স্বাধীনতা থাকবে না। এমতাবস্থায় ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কৃতির আদলে রাজনৈতিক শক্তি নির্মাণের মাধ্যমে পৃথক হওয়া শুরু করল, যা পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান বিভক্তির রাজনীতির পরম্পরায় সাম্প্রদায়িক সংস্কৃতিতে বিরাজমান থাকে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভক্তি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে প্রভাব ফেলেছে। ভারতীয় সমাজ এবং রাষ্ট্রে আমূল পরিবর্তনের নিমিত্তে বৃহত্তর কোনো শিল্পবিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব বা সাংস্কৃতিক বিপ্লব না হওয়ার ফলে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ শাসকরা তাদের শোষণ-নিপীড়ন পাকাপোক্ত করেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রমুখ দেশপ্রেমিকগণ দেখাতে চেয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এ ধারাবাহিকতায় রোকেয়াও সাম্প্রদায়িক উগ্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রবল মতামত তুলে ধরেছেন। সাম্প্রদায়িক উগ্র দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজভাবনায় যদি সার্বজনীনতা না থাকে, অর্থাৎ খুপরিবদ্ধ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বিরাজমান থাকে তাহলে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক অভিন্ন জাতিসত্তা গড়ে উঠতে পারে না। তাই জাতিসত্তার প্রসঙ্গে রোকেয়ার বক্তব্য,

> আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসী বা খ্রীস্টিয়ান অথবা বাঙালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি- আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথম ভারতবাসী তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।[১৮]

রোকেয়া জানতেন সাম্প্রদায়িকতার বীজ থেকে উদ্ভূত কট্টর মুসলমানিত্ব কিংবা কট্টর হিন্দুত্ববাদ উভয়েই ভারতবর্ষের জন্য হানিকর। কাজেই আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ রোকেয়া-মানস ও আদর্শ ছিল আশ্চর্যভাবে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত। ১৯৩৭ সালে বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন,

> নারীকে হিন্দু যে শক্তির আধার বলিয়া পূজা করে, নারীচরিত্রে যে একটি সহজ মহিমা ও শুচিতা আছে যাহা প্রাকৃতিক শক্তির মত স্বতঃস্ফূর্ত এবং পুরুষের পক্ষে অনেক স্থানেই যাহা সাধনসাপেক্ষ, তাহার পরিচয় পাই এই মহীয়সী নারীর চরিত্রচিত্রে। লতা যেমন আপনিই আলোকের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে, যতই বাধা পাক তবুও সেই দিকেই তাহার গতি-এই নারীর জীবনে সত্য ও সুন্দরের প্রতি একটি অনিবার্য প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।... একালে হিন্দু সমাজেও এমন নারী চরিত্র বিরল। কিন্তু তজ্জন্য হিন্দু আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না; কারণ বেগম রোকেয়া শুধুই মুসলিম মহিলা নহেন, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি খাঁটি বাঙালীর মেয়ে। বাঙালী জাতির জাতীয় প্রেরণাই তাঁহাকে পরিচালিত করিয়াছিল।[১৯]

উপসংহার

সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি তথা বিশ্ব পরিসরের সর্বত্র নারীর ক্ষমতায়ন এখন সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো, উৎপাদন, বিতরণ, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়াও জাতীয়-আন্তর্জাতিক মতামত গঠনে সর্বত্র নারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন এ জন্য যে, উন্নত এবং টেকসই জাতি গঠন নারীর অবদান ব্যতীত অসম্ভব। মোট দেশজ উপাদানের (জিডিপি) সিংহভাগ আয় বৃদ্ধিতে নারীর মূর্তশ্রম, বিমূর্ত শ্রম, কায়িক শ্রম, মানসিক শ্রম ওতপ্রোতোভাবে

জড়িত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নির্মাণে স্বাধীনতা, সাবলম্বিতা, আত্মনির্ভরশীলতা, বিজ্ঞানমনস্কতায় নারীকে অবশ্যই উজ্জীবিত করতে হবে। তাই রোকেয়া বারবার উন্নততর শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টির সাথে পরিচিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সারাজীবনের সাধনা নারী-স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন অর্জন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, তিনি ইতিহাস সম্পর্কে সরাসরি কিছু না বললেও তাঁর প্রজ্ঞাসম্মত মননকাঠামো ছিল ইতিহাসসচেতন, যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি তাঁর অসংখ্য রচনায়। সমাজে প্রচলিত প্রথা, প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, আচার-আচরণের অচলায়তন তাঁকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। তাঁর সংশয়ী মনোভাব কোনোকিছুকেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখতে পারেনি। ইতিহাসলব্ধ জ্ঞান দিয়ে তিনি যথার্থভাবেই অনুধাবন করেছিলেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত বৈষম্যগুলো ঐশ্বরিক নয়, বরং তা মানবসৃষ্ট ও কৃত্রিম। এ কারণে তাঁর প্রতিবাদী সত্তা আবেদন জানিয়েছিল, নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে একটি অসাম্প্রদায়িক সাম্যবাদী সমাজ নির্মাণে উজ্জীবিত হতে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. কার্ল মার্কস, ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, অনু., দীপক রয়, *কার্ল মার্কস ফ্রেডারিক এঙ্গেলস রচনা-সংকলন* (কলকাতা: ধ্রুপদী, ১৯৫৯), পৃ. ২১৪

২. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, 'আমাদের অবনতি'; *নবনূর*, ২য় বর্ষ-৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩১১, পৃ. ২১৬-১৮

৩. *তদেব।*

৪. রোকেয়া, 'স্ত্রীজাতির অবনতি', *রোকেয়া রচনাবলি* (ঢাকা: উত্তরণ, ২০০৮), পৃ. ২৯

৫. *তদেব*, পৃ. ১৪

৬. *তদেব*, পৃ. ২৯

৭. মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, *রোকেয়া মানস ও সাহিত্য মূল্যায়ন*, সম্পা. (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭), পৃ. ১৯৬

৮. রোকেয়া, 'স্ত্রীজাতির অবনতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২

৯. *তদেব*, পৃ. ৩০

১০. রোকেয়া, 'ডেলিশিয়া হত্যা', *তদেব*, পৃ. ১৩০

১১. *তদেব*, পৃ. ১৩১

১২. *তদেব*, পৃ. ১৪৬

১৩. *তদেব*, পৃ. ৩৮২

১৪. রোকেয়া, 'চাষার দুক্ষু', *তদেব*, পৃ. ৩৬৯

১৫. রোকেয়া, 'এণ্ডি শিল্প', *তদেব*, পৃ. ৩৭৪

১৬. *তদেব* পৃ. ৩৮

১৭. রোকেয়া, 'স্ত্রীজাতির অবনতি', *তদেব* পৃ. ২৯

১৮. মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

১৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩), পৃ. ৯